আমেরিকা: স্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্ন

আমেরিকান সাম্রাজ্যের পতন এবং বৈশ্বিক জিহাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

আমেরিকা: স্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্ন

আমেরিকান সাম্রাজ্যের পতন এবং বৈশ্বিক জিহাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

সূচিপত্র

পূর্ব কথা ৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতনের তিন চিহ্ন : ৬

ক) খোরাসানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পরাজয় ৬

খ) করোনা ভাইরাস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা ...৭

গ) দাঙ্গা ও সামাজিক মেরুকরণ ৯

মুজাহিদিনের কৌশলের সফলতা ১১

উপসংহার ১২

পূর্ব কথা

সম্মানিত উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ' র এই গুরুত্বপূর্ণ লেখাটির উর্দু সংস্করণ জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন "নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দ" এর নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০ ইংরেজি সংখ্যায় "আমেরিকা: খাব সে ডরাওনে খাব তক আওর আহলে বাররে সাগির কে লিয়ে মাওয়াকে" (امریکہ: خواب سے ڈراؤنے خواب تک اور اہل برِ صغیر کے لیے مواقع) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এর বাংলা মূল সংস্করণটি লেখক আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, যা এখন পুস্তিকা আকারে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান।

সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হল- রচনাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়েদা ব্যাপক করুন! আমীন।

আবু যুবাইদা
০৯ জুমাদাল উলা, ১৪৪২ হিজরি
২৪ ডিসেম্বর, ২০২০ ইংরেজি

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পেছনে দুটি প্রধান কারণের কথা বলা হয়। ১৯৮৬ সালে চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণ, এবং ১৯৮৯ সালে খোরাসানে লাল ফৌজের পরাজয়। যেকোন বড় রাষ্ট্র কিংবা শক্তির পতন একটি জটিল প্রক্রিয়া। অনেকগুলো পরস্পর সংযুক্ত নিয়ামক (factor) এখানে ভূমিকা রাখে। কিন্তু এমন কিছু ঘটনা থাকে যা পতনের প্রক্রিয়াকে সূচনা করে, কিংবা একে এমন পর্যায়গামী করে, যেখান থেকে ফেরার আর সুযোগ থাকে না। চেরনোবিল এবং খোরাসানে পরাজয় ছিল এরূপ দুটি ঘটনা। এই ঘটনাগুলোর প্রভাব ছিল ব্যাপক ও বহুমুখী। উভয়ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়, যা তার অর্থনীতিকে নড়বড়ে অবস্থা থেকে ধসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। একইসঙ্গে এই দুই ঘটনার ফলে ভেঙ্গে পড়ে পরাশক্তি রূপে সোভিয়েত ইউনিয়নের অজেয় এবং পরাক্রমশালী ভাবমূর্তিও।

চেরনোবিলের বিস্ফোরণ বিশ্বের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে, সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র, কমিউনিস্ট শাসন অকেজো। আর তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ব্যর্থ এবং অযোগ্য। এ ঘটনা জনমনে এই ধারণা সুদৃঢ় করে, সমাজতান্ত্রিক কল্পরাজ্যের যে স্বপ্ন কমিউনিস্টরা দেখাত তা অন্তঃসারশূন্য। এই আদর্শ ও ব্যবস্থা ব্যর্থ। অন্যদিকে খোরাসানে সামান্য অস্ত্রে সজ্জিত মুজাহিদিনের কাছে লাল ফৌজের পরাজয়ের ফলে সোভিয়েত শক্তি নিয়ে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে থাকা মুগ্ধতা ও ভয়ও দূরীভূত হয়। প্রমাণিত হয় যে, সোভিয়েত সামরিক শক্তি অপরাজেয় নয়।

একই সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে। এ বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্বের মুসলিমের কাছে বার্তা পৌঁছায় যে, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে, আল্লাহর দ্বীনের জন্য লড়াই করলে 'সুপারপাওয়ারকেও' পরাজিত করা সম্ভবপর। স্বল্প সম্বল নিয়েও অনেক ছোট দল প্রবল-পরাক্রান্ত

প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারে। এই বিজয় বিশ্বজুড়ে জিহাদী আন্দোলনের জাগরণে মৌলিক ভূমিকা রাখে।

আশির দশকের শেষ থেকে ১৯৯১সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়ার ভাঙ্গন ও পতনের যে পর্যায় অতিক্রম করে, বর্তমানে তেমনি এক সময় অতিক্রম করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠা বিশ্বব্যবস্থাও আজ ধসে পড়ার দ্বারপ্রান্তে।

হুবালের মূর্তি ক্ষয়ে গেছে। ক্রমাগত দুলছে,

আর হুবালের পূজারিরা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতনের তিন চিহ্ন :

অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে সংঘটিত তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যের ক্ষয়ে যাওয়া অট্টালিকার বাস্তবতাকে পৃথিবীর মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে। আমি মনে করি, চেরনোবিল বিস্ফোরণ এবং খোরাসানে মুজাহিদিনের বিজয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে যে ভূমিকা পালন করে, এই ঘটনাগুলোও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতনে একই ধরনের কিংবা আরও ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

ক) খোরাসানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পরাজয়

তিনটি ঘটনার প্রথমটি হল, খোরাসানে মুজাহিদিনের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়। যেভাবে প্রায় তিন দশক আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন খোরাসান থেকে পিছু হটেছিল, ঠিক একইভাবে আজ পিছু হটছে

খোরাসান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯ বছর আগে ঔদ্ধত্য ভরে খোরাসানে ছুটে আসা 'সুপারপাওয়ার' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ মুজাহিদিনের কাছে পরাজিত হয়ে প্রস্থানের চেষ্টা করছে। এ কারণেই তারা ইমারতে ইসলামিয়ার সঙ্গে আলোচনার টেবিলে আসতে বাধ্য হয়। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একে চুক্তি বলছে, কিন্তু বাস্তবে এটি হল, খোরাসানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ব্যর্থতাকে 'সম্মানজনক পরাজয়' হিসেবে দেখানোর প্রয়াস মাত্র। যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছুটে এসেছিল তার কিছুই অর্জন তারা করতে পারেনি। বরং যাদেরকে একসময় তারা সন্ত্রাসী, উগ্রবাদী বলেছে, সেই মুজাহিদের সঙ্গে তারা আপস করতে বাধ্য হয়।

এই পরাজয় বিশ্বের মানুষের কাছে প্রমাণ করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে যতই অপরাজেয় বলে প্রমাণের চেষ্টা করুক না কেন, আসলে সে মুজাহিদদের ঈমান ও ইস্তিকামাতের সামনে টিকে থাকতে অক্ষম। এই পরাজয় পৃথিবীর মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, হলিউড মুভি আর বাস্তবতা এক নয়। মিডিয়া আর প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে অজেয় রূপ, যে মূর্তি বিশ্ববাসীর সামনে গড়া হয়– আজ তা ভেঙ্গে গেছে। এবং পুরো বিশ্ব তা মনোযোগের সঙ্গে অবলোকন করেছে।

খ) করোনা ভাইরাস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা

দ্বিতীয় ঘটনা হল, কোভিড-১৯ এর মোকাবেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসহায়ত্ব। করোনা ভাইরাসের কারণে সারা বিশ্বজুড়েই জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এর তীব্র ধাক্কা লাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই বিপর্যয় মোকাবেলায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয় কথিত সুপারপাওয়ার

বলে বিবেচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চেরনোবিলের বিস্ফোরণ যেভাবে কল্পিত সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষতা আর নিয়মতান্ত্রিকতার প্রচলিত ধারণাগুলোকে ভুল প্রমাণিত করে, ঠিক তেমনি করোনা মোকাবেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যার্থতা তার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কার্যকারিতা, পেশাদারিত্ব আর উন্নতির ধারণাগুলোকেও ভুল প্রমাণ করেছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা শুধু প্রশাসনিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা না। বরং বিশ্বের মানুষ একে দেখছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থার (system) ব্যর্থতা হিসেবে।

একইসঙ্গে আমরা দেখছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি কতটা ভঙ্গুর। করোনা ভাইরাসের আক্রমণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এপ্রিল থেকে জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি প্রায় ৩২% সংকুচিত হয়। অথচ, ২০০৮ সালের বৈশ্বিক মন্দার নাজুক সময়ে সংকোচন হয় ৮.৪%। চাকুরি হারা হয় কয়েক কোটি মানুষ। প্রতি সপ্তাহে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ বেকারত্ব ভাতার জন্য আবেদন করছে। অর্থনীতিবিদরা বলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এত খারাপ সময় আর আসেনি।

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ

“তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর এ বর্ণনা বস্তুত মানবজাতির জন্য এক সতর্কবাণী।” [সূরা আল-মুদাসসির, ৩১]

পুরো পৃথিবীর সামনে আজ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তায়ালার এক ক্ষুদ্র সৃষ্টির মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্যও তারা রাখে না। বিশ্বজুড়ে বস্তুবাদী মানুষেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে থাকত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণের চেষ্টা করত। আজ তাদের অনেকেই খোলাখুলি মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্য যেখানে অপরাজেয় হওয়ার বড়াই করত, সেখানে করোনা ভাইরাস এবং এর প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন ও অর্থনীতির শোচনীয় অবস্থা বিশ্বের মানুষের সামনে প্রমাণ করছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হচ্ছে। সামনে অপেক্ষা করছে গভীর, বিপদসংকুল রাত।

গ) দাঙ্গা ও সামাজিক মেরুকরণ

তৃতীয় ঘটনা হল বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন (ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারস- Black Lives Matters) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ ও রাজনীতিতে এর প্রভাব। বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজের বর্ণবাদী চরিত্র এক ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু বর্তমানে যে আন্দোলন চলছে তা কেবল বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন নয়। আদতে এটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সত্তা, ইতিহাস আর পরিচয় নিয়ে বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই বিপরীত মেরুর মধ্যকার সংঘাত।

যার এক দিকে আছে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে সক্রিয় অংশ হিসেবে কাজ করা উগ্র বামপন্থী ANTIFA (Anti-fascist)। এই আন্দোলন আদর্শিকভাবে বামপন্থী ও উত্তর-আধুনিকতাবাদের (postmodernism) বিভিন্ন তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। এদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষাঙ্গ একটিভিস্ট। সমকামী অধিকার থেকে শুরু করে সব উগ্র সেক্যুলার অবস্থানকে এরা সমর্থন করে। এক কথায়, সেকুলার চরমপন্থী। এরা শুধু জর্জ ফ্লয়েডের হত্যা আর পুলিশি আগ্রাসনের বিচার চায় না, বরং এরা মনে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরো ব্যবস্থা, প্রশাসন, সমাজ, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস – সবকিছু কাঠামোগতভাবে বর্ণবাদী। এই

বর্ণবাদ দূর করার উপায় হল, বিদ্যমান সব কিছু ভেঙ্গে আবার নতুন করে গড়ে তোলা।

অন্যদিকে আছে- বর্ণবাদী, অস্ত্রধারী, শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী ইভানজেলিকাল (evangelical) খ্রিস্টানরা। এরা মূলত শ্রমজীবী (working class) মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ মার্কিনরা। ওবামার শাসনামলে ক্ষুব্ধ হয়ে এরা তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত হয়। ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার পিছনে এদের বড় ভূমিকা ছিল। ট্রাম্পের শাসনামলে এরা ধীরে ধীরে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠে। পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন চিন্তা মূলধারার রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে। এই অংশ মনে করে, খ্রিস্টান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ এক অস্তিত্বের লড়াইয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেসব দাঙ্গা সংটিত হচ্ছে, তার মূল কারণ এই দুই মেরুগত সংঘাত। এই সংঘাত শুধু ট্রাম্পকে নিয়ে নয়, জর্জ ফ্লয়েড কিংবা পুলিশি নিষ্ঠুরতা নিয়েও নয়। বরং এই লড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ ও রাজনীতির গভীর ফাটলের পরিচায়ক। এই ফাটল দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হচ্ছিল। কোভিড, জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু, অর্থনীতির দুরবস্থা, সামাজিক অস্থিরতা এবং ২০২০ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে এটা একেবারে সুস্পষ্টভাবে সামনে চলে আসে কেবল। এই দুই পক্ষ, এই দুই মেরুর মধ্যে কোন আপোস সম্ভবপর নয়। সঙ্ঘাত অনিবার্য। ক্রমেই দুই পক্ষের মেরুকরণ ঘটছে। সংঘাত সহিংস হয়ে উঠছে। দুই পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটছে। যত সময় যাবে এই সংঘাত ততই তীব্র হবে।

জনজীবন ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার পরও সরকার ও প্রশাসন এ বিশৃঙ্খলা থামাতে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই না, দাঙ্গার মোকাবেলা কীভাবে করা হবে, তা নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার একমত হতে পারছে না। কেন্দ্র আর রাজ্য একে অপরকে দোষারোপ করছে। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক সংহতি নষ্ট হয়ে গেছে। বড় জাতীয় পলিসি তো দূরের কথা, দাঙ্গা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশি নিষ্ঠুরতার মত বিষয় মোকাবেলাতেও রাজনীতিক দলগুলো, এমনকি প্রশাসনের এক অংশ আরেক অংশের সঙ্গে একমত হতে পারছে না।

পৃথিবীর মানুষ দেখেছে বাকি দুনিয়াকে সভ্যতার শিক্ষা দেয়া, উদারতা আর শান্তির গল্প বলা, অধিকার আর সাম্যের কথা বলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজ কী অবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন এখন পরিণত হয়েছে দুঃস্বপ্নে। আর পুরো দুনিয়ার মানুষ তা দেখছে।

এ প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছি, যেকোন বড় রাষ্ট্র কিংবা শক্তির পতনের পেছনে অনেকগুলো পরস্পর সংযুক্ত নিয়ামক (factor) ভূমিকা রাখে। কাজেই এ তিনটি কারণেই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতন ঘটবে তা আমি দাবি করছি না। কিন্তু আমি মনে করি, এই ঘটনাগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতনের প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করবে এবং একে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যেখান থেকে ফেরত আসার আর সুযোগ থাকে না।

মুজাহিদিনের কৌশলের সফলতা

মাত্র ছয়মাসের ব্যবধানে সামরিক, আর্থনীতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং রাজনীতিক দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অসহায়ত্ব, দেউলিয়াত্ব এই তিন ঘটনার মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত, এটি আল্লাহই প্রকাশ করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন।

এই ক্রমধারার সূচনা যে খোরাসানের মুজাহিদদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় স্বীকারের মাধ্যমে শুরু হয়েছে তাও কাকতালীয় নয়। বরং এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সামনে মহান আল্লাহ পরিষ্কার করে

দেন, আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে জিহাদের রাস্তায় অটল থাকলে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নিরাশ করবেন না। তাদের অভাবনীয় উৎস থেকে নুসরত প্রদান করবেন, সাফল্য দিবেন। বান্দার কাজ শুধু সাধ্য মত চেষ্টা করা। আরশের উপরে যিনি আছেন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে, কীভাবে বান্দাকে নুসরত করেন, সাফল্য দেন তা মানবীয় বুদ্ধি আর যুক্তির বাইরে।

বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদে তিনটি মূল উদ্দেশ্যের কথা শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছিলেন-

ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধে জড়িয়ে দুর্বল করে ফেলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ক্ষমতার অতি-প্রসারণ (strategic overreach) ঘটান, যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বে সামরিক আগ্রাসনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে দেয়া।

গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক সংহতি নষ্ট করে দেয়া।

আলহামদুলিল্লাহ, এই সব উদ্দেশ্যই আজ অর্জিত হয়েছে। এবং এর জলজ্যান্ত প্রমাণ আমাদের সামনেই রয়েছে।

উপসংহার

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্য না, আমি মনে করি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে উঠা বিশ্বব্যবস্থা আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যাকে ইবন খালদুন, টয়েনবি, কেনেডি, জন গ্লাবসহ অনেক মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিক অবধারিত পতনের পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই পতনের প্রক্রিয়া দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবেই

তা শুরু হয়ে গেছে। খোদ পশ্চিমের অনেক গবেষকের কথাতেও এই স্বীকারোক্তি আজ ফুটে উঠছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন পতনের বিভিন্ন প্রভাব এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কাফির-মুশরিকরাও লক্ষ্য করেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর বিশ্বজুড়ে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য খর্ব হওয়ার কারণে সে এখন আর আগের মত বিভিন্ন আঞ্চলিক সংঘাতে জড়াতে চাচ্ছে না। উলটো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিজেদের সামরিক উপস্থিতি কমিয়ে আনছে। অন্যদিকে এই শূন্যস্থান পূরণে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি এগিয়ে আসছে। তারা নিজেদের সক্রিয়তা ও উপস্থিতি বাড়াচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশের নিয়ন্ত্রণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকটাই ভারতের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সে আর এ অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্থানের পর এ অঞ্চলে ইসলাম কায়িমের পথে এখন মূল শত্রু হল মালাউন হিন্দুরা। হিন্দুত্ববাদী শক্তিই এখন হবে মুজাহিদিনের মূল টার্গেট। এই শত্রুর আছে তাওহিদ ও মুসলিমদের সঙ্গে বিদ্বেষের হাজার বছরের রক্তাক্ত ইতিহাস। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া সুসংবাদকে মাথায় রেখে উপমহাদেশের মুসলিমদের উচিৎ এ অঞ্চলে মুসলিমদের ঐতিহাসিক শত্রু, গো-পূজারি হিন্দুদের দিকে মনোযোগ দেয়া, নিজেদের সর্বশক্তি এই শত্রুর উপর প্রয়োগ করা। শত্রুকে কয়েক ফ্রন্টে আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা। বিশেষত, ইযযত ও আত্মত্যাগের ভূমি কাশ্মীরের জিহাদকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর করা। পুরো মুসলিম উম্মাহর উচিৎ কাশ্মীরের ঘটনাবলীর দিকে মনোযোগী হওয়া।

আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ রহমতে আমরা ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছি। তিন দশকের অক্লান্ত পরিশ্রম, আত্মত্যাগ আর রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর বৈশ্বিক জিহাদ এখন প্রবেশ করছে নতুন এক পর্যায়ে।

আল্লাহর ইচ্ছায় ইতিহাসের গতিপথকে বদলে দেয়ার সুযোগ আমাদের হাতের নাগালে ইনশা-আল্লাহ। তাওহীদ ও জিহাদের পথকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে, মুজাহিদিন নেতৃবৃন্দের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী, ইস্তিকামাতের সঙ্গে যদি অগ্রসর হই, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায়, বহুকেন্দ্রিক বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন ময়দানে মুজাহিদদের অগ্রগতি এবং তামকিন অর্জন সম্ভবপর হবে। বিশেষত, উপমহাদেশের মুসলিম ও মুসলিম যুবকদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ হাতছানি দিচ্ছে। খোরাসানের বিজয়ের পর এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আল্লাহর ইচ্ছায় মুজাহিদরা যেকোন শত্রুকে পরাজিত করতে সম্ভবপর। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করা সম্ভবপর সেখানে মালাউন হিন্দুদেরও পরাজিত করা সম্ভবপর ইনশা-আল্লাহ। ময়দান প্রস্তুত হয়ে গেছে, খেলা শুরু হয়ে গেছে, এখন আর মাঠের বাইরে দর্শকের ভূমিকায় বসে থাকার সুযোগ নেই।